অকপট বিশ্বাস। দিন ও রাত্রির মত পরস্পরের সঙ্গে এই দুই বিরোধী ছিরুর কখনও মুখোমুখি দেখা হয় না, কিন্তু কোন বিরোধও নাই। তবে ছিরুর দিবাভাগগুলি অর্থাৎ জীবনের আলোকিত অংশটুকু শীতমণ্ডলের শীতের দিনের মত—অতি সংক্ষিপ্ত তাহার আয়ু।

আজ কিন্তু আরও একটু নূতনত্ব ছিল ছিরুর ব্যবহারে। আজিকার কথাগুলি শুধু মিষ্টই নয়—খানিকটা অভিজাতজনোচিত, ভদ্র এবং সাধু। বিগত কালের দেবসেবক ছিরু হইতেও আজিকার দেবসেবক ছিরু আরো স্বতন্ত্র, আরো নূতন। উত্তেজনার মুখে সেটা কেহ লক্ষ্য করিল না।

কিছুক্ষণ পরই চণ্ডীমণ্ডপের সামনের রাস্তা দিয়া বাউড়ী, ডোম, মুচীদের একপাল ছেলেমেয়েরা সারি বাঁধিয়া কোথাও যাইতেছিল। কাহারও হাতে থালা, কাহারও হাতে গেলাস, কাহারও হাতে কোন রকমের একটা পাত্র। জগন ডাক্তার প্রশ্ন করিল—কোথায় যাবি রে সব দল বেঁধে?

—আজ্ঞে, ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী গো, অন্নপুয়োর পেসাদ নিতে ডেকেছেন।

—কে? ঘোষটা আবার কে? ছিরু? ছিরে পাল সে আবার ঘোষ হল কবে থেকে?

অশালীন ভাষায়—ছিরুকে কয়টা গাল দিয়া ডাক্তার বলিল—ওঃ বেজায় সাধু মাতব্বর হয়ে উঠল দেখছি!

দেবু স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল।

এগারো

দেবু স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল অনেক কথা। ওই নবান্নের ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর।

চণ্ডীমণ্ডপেই গ্রাম্য পাঠশালা বসে; পাঠশালার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন হইতেই চণ্ডীমণ্ডপই পাঠশালার নির্দিষ্ট স্থান। সে বহুকাল আগের কথা। তখন ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড ছিল না, ইউনিয়ন-বোর্ড ছিল না। পাঠশালা ছিল গ্রামের লোকের। লোকেরা পণ্ডিতকে মাসে একটা করিয়া সিধা দিত এবং ছেলে পড়াইত। চণ্ডীমণ্ডপে সে কালে কালী ও শিবের নিত্য-পূজার ব্যবস্থা ছিল এবং ওই পূজক ব্রাহ্মণই তখন ছিল পাঠশালার পণ্ডিত। পরবর্তীকালে পূজকের দেবোত্তর জমি কেমন করিয়া কোথায় উবিয়া গেল কে জানে। লোকে বলে—জমিদারের পূর্ববর্তী এক গোমস্তা দেবোত্তর জমিকে নামমাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া নিজের জোতের অন্তর্গত করিয়া

লইয়াছে। এমন কৌশলে লইয়াছে যে, সে আর উদ্ধারের কোন উপায় নাই। এমন কি, চিহ্নিত জমিগুলোকে কাটিয়া এমনি রূপান্তরিত করিয়াছে যে, সে জমি পর্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। তাহার পরও গ্রাম্য-পৌরোহিত্য, দেব-সেবা এবং পাঠশালাকে অবলম্বন করিয়া এক ব্রাহ্মণ অনেকদিন এখানে ছিল; আজ বৎসর কয়েক আগে সে-ও চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের নূতন নিয়মানুযায়ী অযোগ্যতা হেতু তাহাকে বরখাস্ত করিয়া নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। সম্প্রতি বছর তিনেক পাঠশালার ভার পড়িয়াছে দেবুর হাতে।

এককালে দেবুও এই পাঠশালায় সেই পুরোহিত-পণ্ডিত মশায়ের কাছে পড়িয়াছে। পণ্ডিত একদিকে পূজা করিত 'জয়ন্তী মঙ্গলা কালী'—অকস্মাৎ মন্ত্র বন্ধ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত—এ্যাই—এ্যাই চণ্ডে, পাঁচ তেরম পঁচাত্তর নয়, পাঁচ তেরম পঁয়ষট্টি। ছয় তেরম আটাত্তর। হ্যাঁ।—

ওই অনিরুদ্ধও তখন তাহার সঙ্গে পড়িত। পণ্ডিত তাহাকে বলিত—এ দেশের লোহাতে চেকন কাজ হয় না বাবা, কর্মকার, তুমি 'বিলাত' যাও। বিলাতে কল-কারখানার কারবার, আলপিন-সূচ তৈরী হয় লোহা থেকে। বিলাতী পণ্ডিত না হলে তোমাকে পড়ানো আমার কর্ম নয়।—

ছিরু দেবুর জ্ঞাতি, সম্বন্ধে ভাইপো, কিন্তু বয়সে অনেক বড়। সে প্রথমে তাহার কয়েক ক্লাস উপরে পড়িত; শেষে এক এক ক্লাসে দুই-তিন বৎসর করিয়া বিশ্রাম লইতে লইতে সেদিন দেবুকে সহপাঠীরূপে দেখিতে পাইল, সেইদিনই সে পাঠশালার মোহ জন্মের মত বিসর্জন দিল। তারপরই সে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে—ক্রমে বিষয়-বুদ্ধিতে পাঁচখানা গ্রামের লোককে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। সে আজ গণ্যমান্য ব্যক্তি, গ্রামের মাতব্বর।

অনিরুদ্ধ এবং এই ছিরু পাল—এই দুইজনেই গ্রামখানার সমস্ত শৃঙ্খলা ভাঙিয়া দিল। ওই সঙ্গে গিরীশ ছুতার, তারা নাপিতও আছে। দেবু আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছিল—অনিরুদ্ধ ওই যে দম্ভভরে সামাজিক নিয়ম উপেক্ষা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ভোগ উঠাইয়া লইয়া গেল, অথচ সমাজের কেহ তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? এ কয়েকদিন সে নিজেই লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়াছে, গ্রামের লোকে তাহাকে ভালবাসে, অনেকে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু এক্ষেত্রে সকলেই বলিয়াছে এক কথা—এর আর করবে কি দেবু? উপায় কি বল? যদি থাকে তাহলে তুমি

কর! তবে বুঝচ কি না—উ হবে না! কি সমাজ সমাজ ক'রছ? সমাজ কই?

নাই! দেবু নিজেই বুঝিয়াছে, নাই! সে কালে যে-সব মানুষ এই সমাজ গড়িয়াছিল, এই সমাজ শাসন করিত, এ সমাজকে ভাল করিয়া জানিত, বুঝিত—সে সব মানুষই আর নাই। সে শিক্ষাও নাই, সে দীক্ষাও নাই, সে দৃষ্টি নাই। এ-সব মানুষ আর এক জাতের মানুষ। আর এক ধাতের মানুষ। মানুষের নামে অমানুষ।

জগন ডাক্তার সেদিন বলিয়াছিল—ধ'রে এনে বেটাচ্ছেলে কামারকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লাগাও ঘা-কতক।

জগনের ও-প্রস্তাবে দেবু সায় দিতে পারে নাই। ছি! মানুষকে শিক্ষা দিবার অধিকার আছে, ক্ষেত্র বিশেষে মনুষ্যোচিত শাসন করিবার অধিকারও সে স্বীকার করে: কিন্তু অত্যাচারই একমাত্র শাসন নয়। জীবনে তাহার আকাঙ্খা আছে, কিন্তু সে আকাঙ্খা পরিপূরণের জন্য হীন কৌশল, অত্যাচার ও অন্যায়কে অবলম্বন করিতে সে চায় না। জীবনে তাহার একটি আদর্শবোধও আছে। পাঠ্যাবস্থায় আপনার ভাবী জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনায় সযত্নে সেই বোধটিকে দেবু সযত্নে গড়িয়া তুলিয়াছিল। মহাপুরুষদের দৃষ্টান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গঠিত সেই আদর্শ-বোধ। বালাজীবনের কতকগুলি ঘটনা হইতে কয়েকটি ধারণা তাহার বদ্ধমূল হইয়া আছে। বারংবার নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি-শাণিত যুক্তির আঘাত দিয়াও সে-ধারণাগুলি আজও তাহার খণ্ডিত হয় নাই।

জমিদারকে, ধনী মহাজনকে সে ঘৃণা করে। তাহাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে অন্যায়ের সন্ধান করা যেন তাহার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের অতি-উদার দান-ধ্যান-ধর্ম-কর্মকেও সে মনে করে কোন গুপ্ত গো-বধের স্বেচ্ছাকৃত চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া! তাহার অবশ্য কারণ আছে।

তাহার বাল্যকালে একবার জমিদারবাবুরা বাকী খাজনা আদায়ের জন্য তাহার বাবাকে সমস্ত দিন কাছারিতে আটক রাখিয়াছিল। আতঙ্কিত দেবু তিনবার বাবুদের কাছারিতে গিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু কাঁদিয়াছিল; দুইবার চাপরাশীর ধমক খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। শেষবার বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল—এবার যদি আসবি, ছোঁড়া, তবে কয়েদখানায় বন্ধ করে রেখে দেব। চাপরাশীটা তাহাকে টানিয়া আনিয়া একটা অন্ধকার ঘরও দেখাইয়া দিয়াছিল। বাবুদের অবশ্য কয়েদখানার জন্য স্বর্গধাম কি বৈকুণ্ঠজাতীয়

কোন মহল বা ঘর কোনদিনই ছিল না। নিতান্তই ছোট জমিদার তাহারা, দেবুকে নিছক ভয় দেখাইবার জন্য ও-কথাটা বলা হইয়াছিল – সেটা দেবু আজ বোঝে। কিন্তু জমিদার অত্যাচারী—এ ধারণা তাহাতে একবিন্দু ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

জমিদারের ওই বাকী খাজনা শোধের জন্য তাহার বাপ কঙ্কণার মুখুজ্জে বাবুদের কাছে ঋণ করিয়াছিল। তাহারা তিন বৎসর অন্তে হ্যাণ্ডনোটের নালিশ করিয়া অস্থাবর ক্রোকী পরোয়ানা আনিয়া, গাই-বাছুর-থালা-গেলাস ও অন্যান্য জিনিসপত্র টানিয়া রাস্তায় যেদিন বাহির করিয়াছিল সে দিনের সেই লাঞ্ছনা-বিভীষিকা দেবু কিছুতেই ভুলিতে পারে না। তাহার পর অবশ্য ডিগ্রীর টাকা আসল করিয়া তমসুক লিখিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে বাবুরা অস্থাবর ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে-টাকা তাহার বাবার মৃত্যুর পর সে শোধ করিয়াছে। এই বাবুরা অবশ্য বে-আইনী কখনও কিছু করে না, হিসাবের বাহিরে একটি পয়সা অতিরিক্ত লয় না। লোকে বলে—মুখুজ্জে বাবুদের মত মহাজন বিরল। টাকা আদায়ের জন্য জোর জুলুম নাই, অপমান নাই, সুদ শোধ করিয়া গেলে নালিশ কখনও করিবে না; লোকের সম্পত্তির উপর তাহাদের প্রলোভন নাই। নীলাম করিয়া লওয়ার পরও টাকা দিলেই বাবুরা সম্পত্তি ফেরত দেয়। ইহার একবিন্দু অতিরঞ্জন নয়। তবু দেবু মহাজনকে ক্ষমা করিতে পারে না।

এ-সবের উপর আরও একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহার মনে অক্ষয় হইয়া আছে। স্কুলে সে ছিল সর্বাপেক্ষা দুইটি ভাল ছেলের একটি। তাহার নিচের ক্লাশে পড়িত মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ,—সে ছিল দ্বিতীয় জন। শিক্ষকেরা প্রত্যাশা করিতেন – এই ছেলে দুইটি স্কুলের মুখোজ্জ্বল করিবে। কিন্তু দেবু আজও ভুলিতে পারে না যে, সে ছিল শিক্ষকদের সস্নেহ করুণার পাত্র; ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ পাইত স্নেহের সহিত শ্রদ্ধা আর কঙ্কণার বাবুদের মধ্যম মেধার কয়েকটি ছাত্র পাইত স্নেহের সহিত সম্মান। এমন কি, এই ছিরুকেও স্কুলের হেডপণ্ডিত তোষামোদ করিতেন,—কারণ প্রয়োজনমত ছিরুর বাপের কাছে তিনি কখনও তালগাছ, কখনও জামগাছ, ক্রিয়াকর্মে দশ-পনেরো সের মাছ চাহিয়া লইতেন। ইহা ছাড়া ঘি, চাল, ডাল, গুড় প্রভৃতি তো নিয়মিত উপহার পাইতেন।

ওই পণ্ডিতটির নির্লজ্জ লোভের কথা মনে করিলে দেবুর সর্বাঙ্গ রি-রি করিয়া উঠে! বিশ বৎসর বয়সে ছিরু স্কুলের ফিফথ্ ক্লাস হইতে বিদায় লইলে, পণ্ডিত ছিরুর বাপকে বলিয়াছিল—ছেলেকে সস্কৃত পড়াও মোড়ল।

ছিরুর বাপ ব্রজবল্লভ ছিল শক্তিশালী চাষী—নিজের পরিশ্রমের সাধনায় সে

ঘরে লক্ষ্মীর কৃপা আয়ত্ত করিয়াছিল, কিন্তু নিজে ছিল মূর্খ। তাই বড় সাধ ছিল ছেলেটি তাহার পণ্ডিত হয়। ছিরু বিশ বৎসর বয়সে পশু-স্বভাব সম্পন্ন হইয়া উঠায় বেচারার মনস্তাপের সীমা ছিল না। পণ্ডিতের কথায় সে ছেলেকে পণ্ডিতের ছাত্র করিয়া দিল। ছিরু প্রথমটা আপত্তি করে নাই। পণ্ডিত পড়াইতে আসিয়া গল্প করিতেন। বিশেষ করিয়া বয়স্ক বিবাহিত ছাত্রের কাছে তিনি আদিরসাশ্রিত সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া এবং ঐ ধরনের গল্প বলিয়া বৎসর চারেক নিয়মিতভাবেই বেশ প্রসন্ন গৌরবের সঙ্গে গ্লানিহীন চিত্তে বেতন লইয়াছিলেন। অবশ্য বেতন বেশী নয় মাসিক দুই টাকা। চারি বৎসর পর ছিরু আবার বিদ্রোহ করিল। ছিরুর বাপ কিন্তু নাছোড়বান্দা। ছিরু তখন পণ্ডিতের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বুলি ধরিল—সংস্কৃত পড়িয়া কি হইবে? পড়িতে হইলে সে ইংরাজীই পড়িবে।

ইংরাজী পড়াইবার গৃহশিক্ষক কিন্তু পণ্ডিতের ডবল বেতন দাবী করিল। ছিরু তখন ধরিল—সে স্কুলেই পড়িবে। চব্বিশ বৎসর বয়সে সে আবার আসিয়া ফিফ্‌থ ক্লাসে বসিল। দেবুও তখন ফিফথ ক্লাসে উঠিয়াছে। হঠাৎ ছিরুর নজর পড়িল দেবুর উপর। দেবুর পাশে অনি-কামার। স্কুলে পড়িবার কথা যখন বলিয়াছিল—তখন এই কথাটা ছিরুর মনে হয় নাই। তাহার কল্পনা ছিল অন্যরকম। স্কুলে পড়িবার নাম করিয়া সে কঙ্কণার অথবা স্বগ্রামের নীচ জাতীয়দের পল্লীতে দিনটা কাটাইয়া আসিবে। কিন্তু দেবুকে এবং অনিরুদ্ধকে ক্লাশে দেখিয়া সে আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গেই সে বই-খাতা লইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল। বাড়ী চলিয়া আসিল না। সেই পথে-পথেই সে গিয়া উঠিল তাহার মাতামহের বাড়ী। সেখানে গিয়াই সে তাহার জীবনের আদর্শ গুরু ত্রিপুরা সিংকে পাইয়াছিল। তাহার জীবনে পথ দেখায় যে—সে-ই মানুষের গুরু; মাতামহের মনিব ত্রিপুরা সিংকে দেখিয়া ছিরু তাহাকেই মনে মনে গুরুপদে বরণ করিয়া নিজের কর্ম-জীবন-যাত্রা সুরু করিল। কিন্তু চব্বিশ বৎসর বয়সে ছিরু যেদিন ক্লাশে আসিয়া বসিয়াছিল—সেদিনও পণ্ডিত আসিয়া বলিয়াছিলেন—খবরদার, ছিরুকে দেখে কেউ হেসো না। তাহার মধ্যে ব্যঙ্গ ছিল না—খাতির।—সে কথা দেবুর আজও মনে আছে।

স্কুলের মধ্যে সকলের চেয়ে সম্মানের পাত্র ছিল কঙ্কণার মুখুজ্জেদের মূর্খ ছেলেটা। তিন-তিনজন গৃহশিক্ষক সত্ত্বেও কোনো বিষয়ে তাহার পরীক্ষার নম্বর চল্লিশের কোঠাও পৌঁছিত না। একবার সে সঙ্গীদের মধ্যে রহস্য করিয়া বলিয়াছিল—গাধা পিটে কখনও ঘোড়া হয় না। কথাটা ছেলেটার কানে